অরণ্যের মেয়েরা

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

অরণ্যের কথা এখন থাক। তার সৌন্দর্য আর সম্পদ, তার ভারসাম্য আর ধবংস নিয়ে যা কিছু মোটামোটা বই, শহুরে সমীক্ষা, পণ্ডিতি তত্ত্বকথা - সব এখন তোলা থাক।

আমরা বরং এখন ভাবি ওই মেয়েগুলোর কথা। রোদ আর জলকে সমান অগ্রাহ্য করে বনের মধ্যে দিয়ে যারা দল বেঁধে হেঁটে চলেছে। মাথার ওপর জ্বালানি কাঠ বা ফল পাকুড় বা পানীয় জলের ভারটুকুই শুধু আমরা এতদিন দেখেছি। তা লিয়ে দেখিনি অভাবী সসোরের ভারটার কথা। ওদের কালি পড়া চোখের হাতছানি, শাসনহীন বুকের উথাল - পাথাল নিয়েই মাতাল ছিলাম! অরণ্যের সোঁদা মাটির ওপর হেঁটে ওদের হেশেলে ঢোকার দরকার দেখিনি।

অথচ যদি অরণ্যকে আমাদের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের এক প্রধান অবলম্বন বলে স্বীকার করি তাহলে তাকে রক্ষা করতে এই মেয়েদের প্রয়োজনকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। জানি, অনভ্যস্ততার কারণে কথাটায় একটু খটকা লাগছে।

তাহলে ফিরে যেতে হয় সেই মূল প্রশ্ন ঃ নারী ও প্রকৃতির আলাদা করে কোনও সম্পর্ক কি আছে?

দীর্ঘদিন ধরে এই প্রশ্নের এক ভাববাদী রোমান্টিক উত্তর প্রচলিত রয়েছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্বত্রই নারীকে শারীরবৃত্তীয় কারণেপ্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রকৃতির মতোই নারী সুফলা, সর্বংসহা, নিপীড়িতা এবং বুক ফাটেতবু মুখ ফোটে না। এই তুলনা প্রতিষ্ঠা করার পেছনে পুষপ্রধান সমাজের কেমন কি চত্রান্ত লুকিয়ে আছে তা খুঁজতে অনেক উৎসাহী হবেন। সে বিতর্কে ঢোকার জায়গা এটা নয়। শুধু বলা যায়, বহু যুগ ধরে প্রচলিত এই 'পরিবেশা - নারীবাদ' ছড্রন্তুস্নন্দ্রন্দ্বপ্পন্দন্বদ্পপ্প্প এক অপরিবর্তনীয় নারী সত্তার সঙ্গে প্রকৃতির মিল খুঁজে ফেরে। শ্রেণী, জাতি, গোষ্ঠী, শিক্ষা, অর্থ ইত্যাদির বিভাজনে নারী যে বদলেবদলে যাবে এই বাস্তব বোধকে স্বীকার করে না।

তাই আমাদের আলোচনা থেকে ভাবালুতাকে তাড়াতে গেলে প্রয়োজন এক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর। যেখানে নারীর সঙ্গে অরণ্যের যোগাযোগ খুঁজতে হবে তাদের বাস্তব প্রয়োজনের সম্বন্ধে, নারীর জৈব বৈশিষ্ট্যে নয়। বুঝতে হবে হিমালয়ের বনকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের বিদ্ধে আন্দেলন করছে যে 'চিপ্‌কো' মেয়েরা তারা গাছনে রয়েছে এদের একান্ত ব্যক্তিগত প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির অভিজ''তা। চিরন্তন মাতৃত্বের মতো কোনও ধারণাকে দিয়ে বাইরে থেকে এই মেয়েদের বিচার করতে যাওয়া মূর্খামি। বিচার করতে হবে বাস্তব পরিস্থিতিকে সেই মেয়েদের দৃষ্টিকোন থেকে।

আর একটু স্পষ্ট হই। অরণ্যের আর্য-সামাজিক পরিস্থিতি বা তথাকথিত 'উন্নয়ন' - কে বিচার করা যেতে পারে নানান অবস্থান থেকে। শিল্পপতি বা রাজনৈতিক নেতার নিজস্ব অংক যে সাধারণের থেকে আলাদা হবে সে তো জানা কথাই। কিন্তু পরিবেশবিদ্‌ বা এমনকি ঘরের পুষ মানুষটির দৃষ্টিভঙ্গীর থেকেও অরণ্যের মেয়েদের বিচারের বাস্তবতা অনেকটাই অন্য রকম, অন্যরকম তাদের।

জানি, আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টিকে ব্বিাস করানো কঠিন। তাই এক উদাহরণ নিয়ে আসি। ধরা যাক, এক বনাঞ্চলের এক অংশের জমি সাফ করে কাষ্ঠজাত দ্রব্যেরই এক কারখানা বানানো হল। রাজনৈতিক নেতাদের ঠাণ্ডা করতে সেই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ দেওয়া হল স্থানীয় মানুষদের। পরিবেশবিদদের দাওয়াই মেনে তার পর্শ্ববর্তী জমিতে লাগিয়ে

দেওয়া হল কেটে ফেলা গাছের সমসংখ্যক বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় গাছের চারা। মুক্ত অর্থনীতির ফায়দা তুলতে সেই চারা হিসেবে বাছা হল শুধুই শাল বা মেহগিনি।। এবং বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজারে ছাড়া হল গাছ প্রতি নিশ্চিত লাভের কৃষি বণ্ড।

ব্যবস্থায় ফাঁক নেই কোথাও। জন-স্বার্থ মামলা দায়ের করলে আদালতের বকুনি খেতে হবে আপনাকে।

অথচ একবার যদি বনের ওই মেয়েদের চোখ দিয়ে ব্যবস্থাটা দেখেন --- জনবসতির পাশে মিশ্র গাছের যে বনটি কেটে ফেলা হল, যেখান থেকেই বাড়ির মেয়েরা আগে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করত, সংগ্রহ করত ফল-মূল এখন তাহলে ত াদের যেতে হবে আরও অনেকটা দূরে। গাছের চারাগুলি বড় হলেও এমন একই গাছের বন বা ত্তঙ্গ্নস্ত্তত্তপুব্ধত্তজন্দ্ব অরণ্যে তাদের সব রকমের প্রয়োজন মিটবে না। অনেকটা দূরে যাওয়া মানেই তাদের অতিরিক্ত শক্তিক্ষয়, সময় ব্যয়। এই শক্তি বা সময় তারা আগে অন্য কাজে দিতে পরত --- অর্থোপার্জন বা বিনোদনে। শক্তি ও সময়ের এই বাড়তি খরচের ক ারণে ঘরের কাজ সামলে তাদের পক্ষে নতুন গড়ে ওঠড়া কারখানায় ইচ্ছে থাকলেও কাজ নেওয়া সম্ভব নয়। ঘরের ক াজে পুষের অংশগ্রহণের রেওয়াজ কোনও কালেই খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয় তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াল? কারখানায় কাজ নিয়ে হাতে গরম পয়সা রোজগারের সুযোগটা এল একচেটিয়া পুষের ভাগ্যে। অথচ কারকানা হওয়ার আগে অরন্য থেকে সম্পদ আহরন করে বিত্রি করার যে আদি পদ্ধতি ছিল তাতে ঘরের মেয়েদের ছিল এক প্রত্যক্ষ যোগযোগ। সে প্রত্যক্ষতা ছিন্ন হয়ে যাওযায় সংসারে মেয়েটি তার গুত্ব হারাচ্ছে।

সাক্ষরতা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব, সামাজিক বিধি - নিষেধ ইত্যাদি দিয়ে মেয়েদের দাবিয়ে রাখার পদ্ধতিগুলো তো ছিলই। আছেও, অরণ্য অঞ্চলের মতো অনুন্নত এলাকায় আরও ভয়াবহ ভাবে আছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে। তার সঙ্গে আজকের প্রযুক্তি এসে সবার অলক্ষে নারীর অবস্থানকে আরও অকিঞ্চিৎকর করে তুলছে।

পরিবারে গুত্ব হারানো এই তো একটা উদাহরণ দিলাম। এমন আরও কত আছে।

চাষী পরিবারের মেয়েরা বীজ সংরক্ষণে এবং বাছাইয়ে এক বড় ভূমিকা নিতো। বীজের ভালো মন্দ চেনার ব্যাপারে তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এক স্বাভাবিক বিচারশক্তি গড়ে উঠত। বাড়ির বয়স্ক মহিলারা পারিবারিক অর্থনীতিতে এই এক গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিত বাড়ির মেয়ে, নতুন বৌ। এখন সংকর বীজ চালু করে জ াতীয় এবং আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র গুলি তাঁদের সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

একই অবস্থা ঘরোয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রেও। বনের মধ্যে কোন্ গাছ বা লতার কী গুন, কোনটা খাবার, কোনটা ওষুধ এ স ম্পর্কে শেষ কথা বলতেন অরণ্যের ঠাকুমা দিদিমারাই। এখন তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার অমূল্য ভাণ্ডার কোনও উত্তরাধিক ারী রেখে যেতেপারছে না। ত্তঙ্গ্নস্ত্তত্তপুব্ধত্তজন্দ্ব অরণ্যে দামী দামী গাছের একঘেয়ে সারিকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে অন ামী এলেবেলে লতা - গুল্মের দল। ফলে আমাদের দেশীয় জ্ঞান দেউলিযা হয়ে গেল বা সাধারণ কাটাছেঁড়াতেও অসাধ ারণ বহুজাতিক মলম ব্যবহার করে আমাদের অর্থনীতির কী ক্ষতি হল সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তব। অরণ্যের মেয়েদের দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে গেলে সবচেয়ে বড় ফলাফল হল, পরিবারের মধ্যে দাদিমা তাঁর গুত্ব হারালেন।

আর পরিবারের গুত্ব হারানো মানেই, নারীবাদীরা বাববার হুঁশিয়ার করে দেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পুষ্টি সব দিক থেকেই পেছিয়ে পড়া স্বতঃ সিদ্ধটি প্রমান করে দেওয়া যায় এই অরণ্যের মেয়েদের ক্ষেত্রেও।

জ্বালানি বা পশুখাদ্য জোগাড়ের জন্য তাদের বেশি শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে। বন আর সাধারণ বনাঞ্চল করতে থ াকলে তার থেকে সংগ্রহ করা খাদ্যের পরিমাণ কমবে। জ্বালানি কম একটা প্রবতা তৈরি হবে। ফলে অপুষ্টি, আর খাদ্যের অভাবের মূল প্রকোপটি যে বাড়ির গৃহিনী এবং তারপর তার কন্যা সন্তানের ওপর বর্তাবে সে তো জানাই কথা। বড় দুঃখের অভিজ্ঞতায় তাই সেইমেয়েলি প্রবচনটির জন্ম! হাঁড়িতে কী আছে, তার থেকেও বেশি ভাবনা হাঁড়ির নীচে কী অ াছে।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এইভাবে অপুষ্টির শিকার বেশি হচ্ছে উত্তর ভারতের মেয়েরা, সামাজিক নানা কারণে যাদের অত্যাচার অবিচারও হয় অনেক বেশি।

আর শুধু অপুষ্টি থেকেই যে অস্বাস্থ্য আসছে তাই নয়। রয়েছে আরও কিছু কারণ। গেরস্থালির কাজ করতে গিয়ে মেয়েরা ভুগছে নানা রকম জলবাহিত পেট ও চামড়ার রোগে। মায়েদের দুধে দেখা যাচ্ছে কীটনাশকের বিপজ্জনক মাত্রা।

এখানেই শেষ নয়। অতিরিক্ত সময় ব্যয় প্রসঙ্গে বলেছিলাম, কমে যাচ্ছে অর্থোপার্জন এবং বিনোদনের অবসর। আজকের বাজার অর্থনীতির যুগে বিনোদন নেহাত ফেলনা নয়। মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি, সামাজিক যোগাযোগের উপলক্ষ্য ইত্যাদি তো আছে। সেই সঙ্গে আছে অরণ্যের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, নিজস্ব আবেগ ও সুর। পৃথিবীর শহুরে মানুষকে সুখী আর উদ্বেল করতে সেসুরের ব্যাপক চাহিদা। কিন্তু কে গাইবে সে আবহমান কালের গান? কে করবে তার সযত্ন চর্চা। সময়হীনতার নাগরিক সমস্যা যে গ্রাস করছে বনের মেয়েদেরও। তাই বিশ্বের দরবারের সনাতন কৃষ্টির ধারক হিসেবে ত াদের যে স্বীকৃতি হতে পারত তা লুঠ করে নিচ্ছে রহমন, লাহিড়িদের লাখ টাকার সিন্তেসাইজার। আজকের শিল্পায়নের যুগে পুনর্বাসন এক মানবিক সমাধান হিসেবে স্বীকৃতি। বাঁধের জলে গ্রাম ডুবলে, বন কাটলে জনগোষ্ঠীকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার যে নীতি তাতেও মূল কপটা পড়ে মেয়েদের ওপরেই। দুঃখ বিপদের দিনে যে সামাজিক সম্পর্ক এক বড় সহায়, তাকেই ভেঁঙে দেওয়া হয় পুণর্বাসিত উদ্বাস্তুদের জমিবন্টনে। বাড়ির বউ হয়ত তার বাপের বাড়ির আত্মীয়দের আর কে ানও দিন দেখতে পাবে না।

অরণ্যে আধুনিক প্রযুক্তি আমদানিতে মেয়েদের দুর্দশার এই যে চালচিত্র তার যুক্তি প্রবাহগুলির কোনওটিই নিশ্চয় অবাস্তাব বা কষ্টকল্পিত নয়। কিন্তু আমাদের ভাবনা - চিন্তার ধারাটা যেহেতু কখনও ঠিক এইভাবে বওয়ানো হয়নি তাই অরণ্যের প্রযুক্তি সংত্রান্ত আলোচনায় আমরা বারাবর ভূমিক্ষয়, অক্সিজেন, প্রাণী, বনসম্পদ, এই ধরনের বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছি। ছ্ঠন্দ্বপ্পন্দনব্দহ্ধনন্ত্ত ড্রুনজ্জস্ফপ্পন্দ্রুব্ধপ্পুনব্দপ্পগ্গ - এর স্বাতন্ত্র্য। প্রচলিত পরিবেশ - নারীবাদ থেকে সরে এসে শ্রেণী-জাতি গোষ্ঠী বিভক্ত সমাজে শ্রম সম্পত্তি ক্ষমতার বিভাজনকে মাথায় রেখে নারীর ওপর পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাবকে বিচার করা। এই ধারায় ভাবতে শিখে আমরা বুঝতে পারছি অরণ্য প্রকৃতিতে প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ নিয়ে আমরা এতদিন অ ামাদের আসা এবং আশংকাকে এক গন্ডীতে আবদ্ধ রেখেছিলাম, তার চেয়ে অনেক গভীরতর এক অসুখের জন্ম নিচ্ছে অরণ্যের মেয়েদেরকে ঘিরে।

আবহমান কাল ধরে নারীর প্রতি অবিচার অনাচারকে অনেকাংশে স্তিমিত করতে পেরেছে প্রযুক্তি - নির্ভর আজকের দুনিয় া। কিন্তু তা হেথা নয়, হেথা। এখানে বরং উল্টো। অরণ্যচারী নারী সব সময় সম্পত্তি বা ধর্মাচরণে হয়ত সমানধিকার পেত না, কিন্তু কৃষিকাজে, সংসারিক উপার্জনে ও নিয়ন্ত্রণে তার ছিল অনেকটা সমানাধিকার। প্রযুক্তির আগ্রাসন তার সেই সুখের সময়কে গ্রাস করছে। আমাদের জানা পৃথিবীর চেনা ছকে সব সময় যার হিসেব মিলছে না।

তাই ভালো নেই। ‘চিপকো’ বা ‘নর্মদা বাঁচাও’ ওই ধরণের কিছু পরিবেশ আন্দোলনের স্থানীয় মেয়েদের ভূমিকা যতই দৃষ্ট ান্তস্বরূপ হোক, তা এখনও মূল ধারার ব্যতিত্রম।

সন্দেহ নেই, পরিবেশ আন্দোলন ভারতবর্ষের উন্নয়ন চিন্তায় এখন গভীর প্রভাব ফেলেছে। নীতিনির্ধারনেও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে উঠছে। স্থানীয় সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে, তাদের অংশগ্রহণ করিয়ে প্রকল্প রূপায়নের ঝোঁক বাড়ছে সারা বিশ্বেই। পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটে বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে বেশ কিছু ক্ষয়িষ্ণু বনভূমি সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে ইজার া দেওয়া হয়েছে। এগুলিভালো লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থাকে প্রভাবিত করার পক্ষে এসব ব্যবস্থা একান্ত অপ্রতুল এবং বিক্ষিপ্ত। তাছাড়া বাস্তবরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্যই মুনাফার স্বাদ পাওয়া বহুজাতিক সংস্থার চোখরাঙানিকেও বুড়ো আঙুল দেখানো সম্ভব নয় কোনও সরকারেরই।

অরণ্যের মানুষদের বিশেষত মেয়েদের তাই ভালো থাকার উপায় নেই। তাদের শরীর মনকে খাবলে খুবলে রক্তাক্ত করছে প্রযুক্তির আগ্রাসন। তাকে থামাবে সাধ্য কার।

সুন্দরবন এলাকার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা এ প্রসঙ্গে এক ভয়ংকর আশংকার কথা শোনাচ্ছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিশেষত মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ত্রমবর্ধমান। কীটনাশক মেয়েদের হাতের কাছে মজুত। এই সব আধুনিক উচচপ্রযুক্তি রাসায়নিকগলায় ঢেলে দিলেই মৃত্যুপ্রায় অব্যর্থ। নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে, সেখানে চিকিৎসকের সন্ধান পেয়ে, ওষুধ জোগাড় করতে করতেকম্মো কাবার।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ মেয়েই মারা যাচ্ছে না। কারন তারা মুখে ঢালছে যৎসামান্য রসায়নিক, অথবা মুখে অদৌ না ঢেলে গায়ে মেখে বাড়ি লোককে বিভ্রান্ত করছে। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হচ্ছে ‘ঝুঁকি মারা’। মনোবিজ্ঞ ানীরা বলছেন ‘ড্ডন্দ্বপ্তুনন্ত্ত্ত্রব্ধন্দ্ব ব্দন্দ্বপ্তুন্দ্র ঞ্জ্রুজপ্পক্স। এর পেছনে কাজ করে অবসাদ, নিরাপত্তাহীনতা এবং নিজের প্রতি

মনোযোগ আকর্ষণ করাতে চাওয়ার এক জটিল মানসিক রসায়ন। প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে হয়ত থাকছে শাশুড়ির-বউ ঝগড়া বা অর্থনৈতিক মন্দার মতো চিরাচরিত কোনও বিষয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, আত্মহত্যার প্রবনতা তৈরীর জন্য একটা মানসিক ক্ষেত্রে প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেই প্রস্তুতি না থাকলে হঠাৎ ঘটে যাওয়ার আবেগের কোনও উত্তুঙ্গ বিন্দুতে মন আত্মহত্যার চেষ্টায় সায় দেবে না।

আজকে অরণ্যের আর্য-সামাজিক পরিস্থিতি তার মেয়েদের মনকে এমন এক ভয়ানক প্রস্তুতি দেওয়ার পক্ষে অনুকূল। প্রযুক্তির আগ্রাসন বনের মেয়েদের আজ সেই চরম সীমার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে।

সময় আর বেশি নেই। প্রমাণিত হয়ে গেছে, অরণ্যের মেয়েদের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে ও উন্নয়নে সামিল করলে শুধু তার বা তার পরিবারেই উন্নতি হবে না, প্রকল্পটিও সফলতার মুখ দেখবে। অথচ তবু নীতিনির্ধারনে স্থানীয় মহিলাদের গুত্ব দিতেপ্রশাসনের এখনও গড়িমসি। পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত এক গুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু পথ এখনও অনেক বাকি।

নিরাপত্তাহীনতায় আর অবসাদে ক্লিষ্ট যে মেয়েরা ঝুঁকি মারতে চলেছে তাদের উপেক্ষা করা বড় ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে। আমাদের অস্তিত্বের ঝুঁকি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com